রেহানা পারভীন

কড়ই-কাদিপুর গণহত্যা

ভূমিকা

জয়পুরহাট বাংলাদেশের অন্যতম সীমান্তবর্তী জেলা। এর পশ্চিম সীমান্তে রয়েছে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য। মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকায় বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে যে গণজাগরণের জোয়ার এসেছিল জয়পুরহাট এর বাইরে ছিল না। এ গণজোয়ারের পথ ধরেই শুরু হয় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। ফলে মুক্তিযুদ্ধে আক্রান্ত হয়েছিল প্রতিটি দেশপ্রেমিক বাঙালি। গণহত্যার শিকার এসব বাঙালির করুণ ইতিহাস দীর্ঘসময় ধরে মূলধারার ইতিহাস চর্চার বাইরে ছিল। কড়ই ও কাদিপুর জয়পুরহাট জেলার সদর উপজেলার বম্বু ইউনিয়নে দুটি গ্রাম। গ্রাম দুটি পাশাপাশি অবস্থিত এবং বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকেও কাছাকাছি। হিন্দুপ্রধান গ্রাম দুটিতে প্রধানত বসতি ছিল মৃৎশিল্পী বা পাল সম্প্রদায়ের। উল্লেখ্য যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে প্রথম মাঠপর্যায়ে গবেষণা জরিপ পরিচালনা করেন ডা. এম. এ. হাসান। তাঁর গ্রন্থে জয়পুরহাট জেলার কড়ই-কাদিপুর ও পাগলাদেওয়ান বধ্যভূমির উল্লেখ রয়েছে। তিনি বলেন- কড়ই গ্রামের পালপাড়ায় হিন্দুদের ভিটেয় বাতি জ্বালাবার মতো এখন কেউ নেই। শূন্য বিরান জনপদ।[১] ড. হাসান তাঁর বিবরণে ডোম পুকুর পাড়ে ৩৬১ জনের গণকবর দেওয়ার কথা উল্লেখ করেন। পরবর্তী গ্রন্থগুলোতে ৩৬১/৩৭১ সংখ্যাটি কড়ই-কাদিপুর গণহত্যার মোট শহিদের সংখ্যা বলে উল্লেখ করা হয়। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক অপর প্রামাণ্য দলিল ড. মুনতাসীর মামুন সম্পাদিত *মুক্তিযুদ্ধ কোষ*। কোষের দ্বিতীয় খণ্ডে উল্লিখিত দুটি ছাড়াও পাঁচবিবি গণহত্যার তথ্য পাওয়া যায়। ড. মামুনের *মুক্তিযুদ্ধ কোষে* কড়ই-কাদিপুর গণহত্যা সংঘটিত হওয়ার দিনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে।[২] তবে উল্লিখিত দুটি গবেষণায় শহিদের নামের কোনো তালিকা পাওয়া যায় না। *১৯৭১: গণহত্যা-নির্যাতন জাদুঘর ও আর্কাইভ*-এর অধীনে পরিচালিত গবেষণা জরিপে দেখা যায় কড়ই এবং কাদিপুর গ্রাম দুটিতে পূর্বের গ্রন্থগুলোতে উল্লেখকৃত নির্দিষ্ট কয়েকটি

স্থানেই নয় গ্রাম দুটির প্রায় প্রতিটি পাড়ায়, প্রতিটি বাড়িতে গণহত্যা হয়েছে। ফলে ঐদিন কড়ই ও কাদিপুর গ্রাম দুটিতে মোট কতজন গণহত্যার শিকার হয়েছিল তার সংখ্যাগত হিসাব তুলে ধরা সম্ভব হয়নি।

ভৌগোলিক অবস্থান

জয়পুরহাট জেলা বর্তমান রাজশাহী বিভাগের অন্তর্গত। বগুড়া জেলার অধীনে ১৯৭১ সালের জানুয়ারি মাসে জয়পুরহাট মহকুমা প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন এ মহকুমার থানা ছিল চারটি- জয়পুরহাট, পাঁচবিবি, ক্ষেতলাল, আক্কেলপুর। স্বাধীনতার পর ১৯৮৪ সালের ২৬ জানুয়ারি জয়পুরহাট জেলায় উন্নীত হয়। বর্তমানে এ জেলায় ০৫টি উপজেলা, ০৫টি পৌরসভা, ৩২টি ইউনিয়ন ও ৯৮৮টি গ্রাম রয়েছে।

জয়পুরহাট সদরের প্রধান ডাকঘর বর্তমানে যে স্থানে তার পূর্বপাশে বন-জঙ্গল কেটে একটি ছোট হাট বসতো। হাটটি দিনে শুরু হয়ে দিনেই শেষ হয়ে যেত। কারণ রাতে ছিল বাঘের ভয় ফলে হাটফেরত মানুষেরা দলবদ্ধ হয়ে লাঠি, মশাল, পাটখড়ি সঙ্গে নিয়ে চলতো। এই হাট বাঘবাড়ি হাট নামে পরিচিত হয়ে ওঠে।[৩] জেলার নামকরণের ইতিহাস নিয়ে নানা মত রয়েছে। কারো কারো মতে জয়পুরহাট সদরের খঞ্জনপুরে পাল রাজা জয়পালের প্রাসাদ ছিল। জয়পালের পুত্র রাজা গোরক্ষনাথ চৌধুরী পিতার নামানুসারে স্থানের নামকরণ করেন জয়পুর। ভারতের জয়পুর থেকে একে পৃথক করতে নামের শেষে হাট যুক্ত করে হয় জয়পুরহাট।

ব্রিটিশ আমলে উল্লিখিত বাঘবাড়িসহ বর্তমান জয়পুরহাট ও পাঁচবিবি থানার গ্রামগুলো নিয়ে লাল বাজার নামে থানা গঠিত হয় যা দিনাজপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৮২১ সালে উক্ত লাল বাজার থানাকে জয়পুরহাট ও পাঁচবিবি থানায় বিভক্ত করে বগুড়া জেলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৮৭৫-৭৭ সালে এ অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ হয়। ফলে পরবর্তীকালে দুর্ভিক্ষ বা দুর্যোগ মোকাবিলায় যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করার লক্ষ্যে এ অঞ্চলে রেল লাইন বসানো হয়। রেল যোগাযোগকে কেন্দ্র করে এখানে বসতি বাড়তে থাকে এবং জয়পুরহাট নামটি প্রসিদ্ধি লাভ করে।[৪]

বর্তমানে জয়পুরহাট জেলার আয়তন ৯৬৫.৪৪ বর্গ কিলোমিটার। এর উত্তরে দিনাজপুর জেলা, দক্ষিণে বগুড়া ও নওগাঁ জেলা, পূর্বে গাইবান্ধা ও বগুড়া জেলা, পশ্চিমে নওগাঁ জেলা ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য। জেলার অবস্থান ২৪.৫১ থেকে ২৫.১৭ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮.৫৫ থেকে ৮৮.১৭ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ।

জয়পুরহাট সদর থানা গঠিত হয় ১৯১৮ সালে। ১৯৮৪ সালে থানাটি উপজেলায় রূপান্তর হয়। জয়পুরহাট সদর উপজেলার আয়তন ২৫২.১৮ বর্গ কিলোমিটার। এর অবস্থান ২৫ ডিগ্রি ০১ মিনিট থেকে ২৫ ডিগ্রি ১৩ মিনিট উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮ ডিগ্রি ৫৫ মিনিট থেকে ৮৯ ডিগ্রি ১০ মিনিট পূর্ব দ্রাঘিমাংশ পর্যন্ত।

উত্তরে পাঁচবিবি উপজেলা ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণে ক্ষেতলাল, আক্কেলপুর ও বদলগাছি উপজেলা, পূর্বে কালাই ও ক্ষেতলাল উপজেলা, পশ্চিমে ধামরাই উপজেলা ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ।

জয়পুরহাট সদর উপজেলার প্রধান নদী ছোট যমুনা, তুলসিগঙ্গা ও হারাবতী নদী।

বর্তমানে জয়পুরহাট সদর উপজেলায় একটি পৌরসভা ও ০৯টি ইউনিয়ন, ১৮৮টি মৌজা ও ২২৫টি গ্রাম রয়েছে। ইউনিয়নগুলো হলো– আমদই, চক বরকত, জামালপুর, দোগাছি, ধলাহার, পুরানাপৈল, বম্বু, ভাদশা, মোহাম্মদাবাদ।[৫]

স্থানটির তৎকালীন অবস্থা

আলোচ্য গণহত্যা স্থল কড়ই ও কাদিপুর গ্রাম দুটি জয়পুরহাট জেলার সদর উপজেলার বম্বু ইউনিয়নে অবস্থিত। জয়পুরহাট সদর থেকে ৬ কি. মি. দূরে, গ্রাম দুটি অবস্থান পাশাপাশি। এর উত্তরে পুরানাপৈল ইউনিয়নের হেলকুন্ডা গ্রাম, দক্ষিণের কোমর গ্রাম, পূর্বে খুমারি এবং পশ্চিমে রয়েছে হানাই গ্রাম। পশ্চিম দিক থেকে আসা ব্রিটিশ আমলের হিলি দিনাজপুর সড়ক ধরে এ গ্রামে প্রবেশ করা যায়। সড়কটি তখন পর্যন্ত ছিল কাঁচা এবং কড়ই-কাদিপুর যাওয়ার একমাত্র সড়ক। একাত্তর সালে গ্রাম দুটিতে কোনো স্কুল-কলেজ ছিল না, ছিল কেবল একটি জুনিয়র মাদ্রাসা। কাদিপুর গ্রামটি ছিল সম্পূর্ণরূপে হিন্দু অধ্যুষিত এবং অধিবাসীদের অধিকাংশ ছিল পাল সম্প্রদায়ের অর্থাৎ তাদের পেশা ছিল মাটির জিনিসপত্র তৈরি করা। এছাড়া ছিল বর্মণ সম্প্রদায় যাদের পেশা ছিল কৃষিকাজ। অপরদিকে কড়ই গ্রামে মোহন্ত, দেবনাথ ও শীল সম্প্রদায়ের লোক ছিল। মোহন্ত সম্প্রদায় ছিল মূলত স্বর্ণকার, দেবনাথ সম্প্রদায় বিছানা-পাটি এসব তৈরি করত আর শীল সম্প্রদায় চুলকাটার কাজে নিয়োজিত ছিল। কড়ইয়ে বাকি সবাই ছিল মুসলমান এবং তারাও মোটামুটি কৃষিজীবী।

বম্বু ইউনিয়নের জসিম মওলানা ছিলেন অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি এবং মুসলিম লীগের সমর্থক। ডা. আব্দুর রহিমও ছিলেন কড়ই কাদিপুর

গণহত্যার দালালদের অন্যতম। মান্নান মৌলবি অন্যতম হোতা, যিনি এখনও কাদিপুর দখল করে আছেন। এরা বহু সংখ্যক রাজাকারকে একত্র করে কড়ই-কাদিপুর গণহত্যায় পাকিস্তানিদের সহায়তা করেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে পাকিস্তানি সশস্ত্র বাহিনী যে গণহত্যা শুরু করে প্রথম পর্যায়ে তাদের গণহত্যার লক্ষ্য ছিল সেইসব বাঙালি যারা আওয়ামী লীগ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহকর্মী ছিলেন এবং হিন্দু জনগোষ্ঠী। কেবল হিন্দু হওয়ায় বা আওয়ামী লীগকে সমর্থন করার কারণে এই যে মানুষ হত্যার ঘৃণ্য যজ্ঞ তা দেখে জয়পুরহাটের অধিবাসী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের শিক্ষক হাবিবুর রহমান ঘৃণা-ক্ষোভে নিজের নাম বদলে রাখেন 'দেবদাস'।[৩]

গণহত্যার পটভূমি

উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের পর ধাপে ধাপে সারাদেশের মতো জয়পুরহাটেও আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। এরই মাঝে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. শামসুজ্জোহার হত্যাকাণ্ডকে ঘিরে উত্তরবঙ্গে পাকিস্তানি শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৭০ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের ঐতিহাসিক বিজয় মূলত পাকিস্তানি শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনগণের সুস্পষ্ট রায়।[৪]

১৯৭০ সালে পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনকে বাঙালিরা আইনসঙ্গত উপায়ে তাদের অধিকার আদায়ের সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে। ১৯৬৯-এর গণ-আন্দোলন, গণজোয়ারের যে পথ প্রশস্ত করে দেয়, ৭০ এর নির্বাচনে তা স্থিতি লাভ করে। সত্তরের নির্বাচনে জয়পুরহাটে জাতীয় পরিষদের প্রার্থী ছিলেন আওয়ামী লীগের ড. মফিজ চৌধুরী, মুসলিম লীগের (কনভেনশন) আব্দুল আলীম, জামাতে ইসলামীর আব্বাস আলী খান এবং মুসলিম লীগের (কাইয়ুম গ্রুপ) অধ্যক্ষ মহসীন আলী দেওয়ান। এই নির্বাচনে বিপুল ভোটে আওয়ামী লীগ প্রার্থী ড. মফিজ চৌধুরী নির্বাচিত হন। প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে প্রার্থী ছিলেন আওয়ামী লীগের ডা. ছাইদুর রহমান, ন্যাপের (মোজাফফর) মীর শহীদ মণ্ডল, মুসলিম লীগের ডা. রোস্তম আলী মণ্ডল এবং জামায়াতে ইসলামীর মৌলানা ইব্রাহীম হোসেন মহব্বতপুরী। এই নির্বাচনের আওয়ামী লীগ প্রার্থী ডা. ছাইদুর রহমান বিজয়ী হন। আদমদীঘি-ক্ষেতলাল নির্বাচনী এলাকায় জাতীয় পরিষদে মজিবুর রহমান এবং প্রাদেশিক পরিষদে কসিম উদ্দীন ও আবুল হাসানাত চৌধুরী (মতি) নির্বাচিত হন। সত্তরের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন

আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী ড. মফিজ চৌধুরীর নির্বাচনী প্রচারণায় বঙ্গবন্ধু জয়পুরহাট রেলস্টেশনে যে জনসভা করেছিলেন তা মহকুমায় বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শোনার পর জয়পুরহাটের মতো প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতির দ্বারা প্রভাবিত জনপদ যেন জেগে ওঠে।[৮]

তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের নির্বাচনে বিপুল বিজয়ের আনন্দ মিলিয়ে না যেতেই ক্ষমতা হস্তান্তর না করার ষড়যন্ত্রের শিকার হয় বিজয়ী রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ। ১৯৭১ সালের ১লা মার্চে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁন জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন। এই ঘোষণা সারাদেশের মতো জয়পুরহাটেও তীব্র অসন্তোষ ও চরম ক্ষোভের সৃষ্টি করে। এই ঘোষণার পরপরই জয়পুহাটের নানা স্থানে মিছিল, লাঠি মিছিল ও মশাল মিছিল বের হয়। ২রা মার্চ থেকে ৬ই মার্চ পর্যন্ত প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ অব্যাহত থাকে। ৭ই মার্চে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ শোনা যায় পরদিন ৮ মার্চে। এই ভাষণের পর থেকে সর্বস্তরের জনগণ আন্দোলনে যোগ দেয়। ছাত্রজনতা ও রাজনৈতিক নেতা-কর্মীরা জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণকে বেগবান করে তোলেন। বঙ্গবন্ধুর ডাকে সারাদেশের মতো জয়পুরহাটেও ১০ই মার্চে সংগ্রাম কমিটি গঠন করা হয়।[৯] সভায় সভাপতিত্ব করেন আব্দুল মোতালেব চৌধুরী। বিভিন্ন দলের স্থানীয় নেতৃবৃন্দকে সংগ্রাম কমিটির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। স্থানীয় সরকারি কর্মকর্তাগণকে সংগ্রাম কমিটির উপদেষ্টা হিসেবে রাখা হয়। মহকুমা প্রশাসক ছিলেন প্রধান উপদেষ্টা। সংগ্রাম কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক শাকিল আহমেদের নেতৃত্বে জয়পুরহাট কলেজ মাঠে মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং ক্যাম্প খোলা হয়। অস্ত্রে ট্রেনিং প্রাপ্ত সৈনিক আজিজুল বারী, আব্দুল কাদের এবং আব্দুল ওয়াদুদকে শাকিল আহমেদের সহকারী নিযুক্ত করা হয়। জয়পুরহাটে পাকিস্তানি আক্রমণের পর মুক্তিযোদ্ধাদের ভারতে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এই ট্রেনিং ক্যাম্প চালু ছিল।

ঢাকার পল্টন ময়দানে ছাত্রলীগের উদ্যোগে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে যেন নতুন দেশের আকাঙ্ক্ষা সবার মধ্যে তীব্র হয়ে ওঠে। জয়পুরহাটে রাজা চৌধুরী ও অন্যান্য নেতারা আলকেচ মিয়ার (দর্জি) কাছ থেকে বাংলাদেশের পতাকা তৈরি করে সরকারি ডাক্তারখানার মাঠ, বর্তমান শহিদ ডা. আবুল কাশেম ময়দানে তা আনুষ্ঠানিকভাবে উত্তোলন করেন।

এপ্রিলের ২০ তারিখ বিকেল বেলা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী পাঁচবিবির হাটে প্রবেশ করে এবং গণহত্যা চালায়। ২৫ এপ্রিল জয়পুরহাট

সদরে প্রবেশের পর ঘাঁটি স্থাপন করে এবং গণহত্যা শুরু করে। ২৬ এপ্রিল ১৯৭১ পাকিস্তানি বাহিনী স্থানীয় দালালদের সঙ্গে নিয়ে কড়ই-কাদিপুর গ্রাম আক্রমণ করে এবং মাত্র এক ঘন্টার মধ্যে শত শত মানুষকে হত্যা করে।

কড়ই-কাদিপুর গণহত্যা

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে জয়পুরহাটে মুসলিম লীগ ও জামায়াতে ইসলামী আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের নিকট পরাজিত হয়। পরাজিত দুই প্রার্থী মুসলিম লীগের (কনভেনশন) আব্দুল আলীম এবং জামায়াতে ইসলামীর আব্বাস আলী খান ২৫ মার্চ পাকিস্তানি বাহিনী গণহত্যা শুরু করলে জয়পুরহাটে পাকিস্তানের পক্ষে তাদের তৎপরতা শুরু করেন। আব্দুল আলীম স্থানীয় বিহারি ও ধর্মান্ধদের নিয়ে হিন্দু সম্প্রদায়, আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং দেশপ্রেমিক বাঙালিদের নানাভাবে নির্যাতন শুরু করে। জামায়াত নেতা আব্বাস আলী খান এসময় কেন্দ্রের সামরিক সরকারের সঙ্গে সখ্য তৈরি করে এবং পরবর্তীকালে প্রহসনমূলক সরকারের মন্ত্রী হয়ে বসেন। একাত্তর সালে আব্দুল আলীম এবং তার সমর্থকদের অত্যাচার, হত্যা, লুটতরাজের ঘটনা ছিল নজিরবিহীন। মুক্তিযুদ্ধের সংগঠকদের পাকিস্তানিদের হাতে তুলে দেওয়া, তাদের বাড়ি-ঘর লুট, দখল করে সম্পদ ভোগ করা সব অপকর্মই করেছে তারা। কড়ই-কাদিপুর গণহত্যায়ও তাদের প্রত্যক্ষ মদত ছিল।

বম্বু ইউনিয়নের মান্নান মৌলবি, জসিম মাওলানা, ডা. আব্দুর রহিমসহ অনেকেই ছিলেন পাকিস্তানপন্থি। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে কড়ই-কাদিপুরসহ এই ইউনিয়ন ও এর আশপাশের এলাকাগুলোর গ্রামবাসীরা মান্নান মৌলবির নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পায়নি। এমনকি কাদিপুরের হিন্দু সম্প্রদায়ের সম্পত্তি এখনও মান্নানের পরিবারের দখলে বলে স্থানীয়রা জানান।[১০]

পাকিস্তানিরা জয়পুরহাট আসার আগেই এসব দালালদের অত্যাচারে স্থানীয় সাধারণ মানুষ পাঁচবিবির মুক্তিযোদ্ধা প্রশিক্ষণক্যাম্পে ইপিআর ও মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে সাহায্য কামনা করে। ২০ এপ্রিল ১৯৭১ সকালবেলা পাঁচবিবি থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দল সদরে যায় আব্দুল আলীমকে গ্রেফতার করতে। আব্দুল আলীম রাজাকারদের সহায়তায় পালিয়ে যেতে সক্ষম হন।[১১] মুক্তিযোদ্ধার দলটি পাঁচবিবি ফিরে যাওয়ার আগেই এই দিন বিকেলে পাকিস্তানি সৈন্যদের একটি দল পাঁচবিবি হাটে প্রবেশ করে এবং গণহত্যা চালায়। এ গণহত্যার পর জয়পুরহাটের মুক্তিযোদ্ধারা ক্রমান্বয়ে সীমান্তের ওপারে ভারতে চলে যায় এবং সেখান থেকেই মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকে।

২৪ এপ্রিল রাতে পাকিস্তানি সেনারা বগুড়ার শান্তাহার থেকে রেলযোগে জয়পুরহাট সদরে আসে। আসার সময় তারা রেল স্টেশনের অনতিদূরে সেতুর কাছে তিনজন নিরীহ মানুষকে গুলি করে হত্যা করার মাধ্যমে জয়পুরহাট সদরে গণহত্যার সূচনা করে। ২৫ এপ্রিল দিনব্যাপী পাকিস্তানি বাহিনী জয়পুরহাট সদর থানা, বুলুপাড়া, গাড়িয়াকান্ত ইত্যাদি স্থানে গণহত্যা চালায়।

২৬ এপ্রিল ১৯৭১ স্থানীয় দালালদের একটি বড় দলসহ পাকিস্তানি সৈন্যরা সদর উপজেলার বম্বু ইউনিয়নের পাশাপাশি দুটি গ্রাম কড়ই-কাদিপুর আক্রমণ করে। মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম বৃহৎ গণহত্যা চুকনগর গণহত্যার মতো এখানেও পাকিস্তানি বাহিনী স্বল্পতম সময়ে অগণিত মানুষকে হত্যা করে।[৫]

হিন্দুপ্রধান গ্রাম হওয়ায় কড়ই-কাদিপুরের অধিবাসীরা আতঙ্কের মধ্যে দিনানিপাত করছিল। কেননা তারা সকলেই ছিল আওয়ামী লীগের ভোটার। কড়ই-কাদিপুর আক্রান্ত হওয়ার আগেই এর পার্শ্ববর্তী নানা গ্রামের আক্রমণের খবরাখবর পাচ্ছিল কড়ই-কাদিপুর গ্রামবাসী। স্থানীয় মুসলিম লীগ ও জামায়াতে ইসলামীর কর্মীরা পাকিস্তানি সৈন্যদের পথ দেখিয়ে কড়ই-কাদিপুর নিয়ে যায়।

২৬শে এপ্রিল ছিল সোমবার, সকাল ১০-১১টার দিকে কড়ই-কাদিপুর আক্রান্ত হয়। দু'দিন আগে থেকে দূরদূরান্তের গ্রামে লুটপাট এবং অগ্নিসংযোগের ঘটনা কড়ই-কাদিপুর এলাকা থেকে প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছিল। একটা কিছু হবে এমন আশঙ্কা নিয়ে সবাই ছিল ভীত-সন্ত্রস্ত। তবুও মানুষ জীবনের তাগিদে কর্মব্যস্ত হয়ে ওঠে। গণহত্যার দিন কড়ই-কাদিপুরের মানুষেরা দেখতে পেল, কড়ই গ্রামের পশ্চিম কোণে আগুন জ্বলতে শুরু করেছে। দেখতে দেখতে আগুন ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। সঙ্গে গুলি আর মানুষের হইহল্লার আওয়াজ। নিরীহ গ্রামবাসী কাজ ফেলে আতঙ্কে প্রাণ ভয়ে ছুটতে শুরু করে। যাদের ঘরে তখনও আগুন দেওয়া হয়নি তারা ভাবল আগুন দেওয়ার আগে যতটা সম্ভব জিনিসপত্র সঙ্গে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলে বাঁচতে পারবে। কিন্তু মৃত্যু সেদিন চারদিকে।

কড়ই ও কাদিপুরকে সেদিন হানাদাররা আক্ষরিক অর্থেই মানব শূন্য করতে চেয়েছিল। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান পাকিস্তানি সেনাদের সঙ্গে সঙ্গে লাঠির মাথায় পাকিস্তানি পতাকা বেঁধে শত শত দালাল গ্রামগুলো ঘিরে ফেলে। গ্রামবাসীরা অসহায়ের মতো ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে। যারা পালানোর চেষ্টা করে, তাদের ধরে এনে মাঠে জড়ো করা হয়।[১২] কাপড়-চোপড়, স্ত্রী-সন্তান, টাকা-পয়সা যার যতটুকু আছে সঙ্গে নিয়ে ঘর ছেড়ে

বেরিয়ে এলে দালালরা তাদের কড়ইয়ের ডোমপুকুর সংলগ্ন মাঠে সারিবদ্ধ করে দাঁড় করায়। বৈশাখের রোদে আগুন ছড়িয়ে পড়তে থাকলো দ্রুত। দ্রুততম সময়ে অধিক মানুষকে হত্যা করার জন্য পাকিস্তানি সৈন্যরা সারিবদ্ধ মানুষগুলোকে গুলি করে হত্যা করতে থাকে। একদিকে পাকিস্তানি সৈন্যরা গুলি করে মানুষ হত্যা করতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে দালালেরা মৃত-অর্ধমৃত মানুষগুলোকে মাটি চাপা দিতে থাকে। পরিবারের অন্যদের সামনেই চলতে থাকে এই বর্বরতা। গুলির পর আবার লাথি দিয়ে দেখা হয় নিশ্চিত মৃত্যু হয়েছে কিনা, যারা জীবিত ছিল তাদের বেয়নেট দিয়ে আঘাত করে হত্যা করা হয়। গোবিন্দ নামে একজন, পক্ষাঘাতগ্রস্ত, তাকেও জীবন্ত কবর দেওয়া হয়।

গ্রামের প্রধান বা মণ্ডল ছিলেন হলধর পাল। দালালরা তাকে ধরে পাকিস্তানিদের সামনে নিয়ে আসে। পাকিস্তানি সেনার হুকুমে এক দালাল হলধর পালকে খেজুরের রসের জন্য গাছ কাটার ধারালো অস্ত্র 'ছোন' দিয়ে কেটে দুই টুকরা করে ফেলে।

বৃহৎ গণহত্যাটি ডোমপুকুর পাড়ে হলেও কড়ই ও কাদিপুর জুড়ে চলছিল হত্যার উৎসব।[১৩] পাকিস্তানি সেনারা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে দালালদের সহযোগে পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে গণহত্যা চালাতে থাকে। সোনার পাড়ায় দিজেনচন্দ্র দেবনাথের বাড়ির সামনেই তারা প্রত্যক্ষ করে এমন গণহত্যা, যেখানে একটি জায়গায় নয়জনকে হত্যা করে সে স্থানে চাষের জমিতে মাটি চাপা দেওয়া হয়।[১৪]

অনেকের মা, স্ত্রী-সন্তানেরা দালালদের হাত-পা ধরে কাকুতি মিনতি করে- ভাই, স্বামী, পিতা কিংবা সন্তানদের ছেড়ে দেবার জন্য। তখন তাদের টাকা-পয়সা ও মূল্যবান অলংকারের পরিবর্তে কাউকে কাউকে লাইন থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। দেবেন পাল (৫২), অর্থ-স্বর্ণালঙ্কারের বিনিময়ে স্ত্রী এবং মাকে নিয়ে লাইন থেকে বেরিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। তার শরীরের বস্ত্র খুলে পড়েছিল আগেই। জীবনের তাগিদে উলঙ্গ অবস্থায় সবকিছু ফেলে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে প্রাণে বেঁচেছিলেন।

কেউ হারিয়েছেন পিতা, কেউ স্বামী, কেউ ভাই, কেউ সন্তান, কেউ পরিবারের সবাইকে। দেবেন পালের পরিবারের ১৮ জন গণহত্যার শিকার হন। সাবিত্রী নামে এক নারী হারিয়েছেন শ্বশুর, দেবর, নাতি ও ভাশুরের ছেলেকে। এ পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের মাত্র দু'সপ্তাহের মাথায় শোকে-হতাশায় মারা যান সাবিত্রীর স্বামী আশারু বর্মণ। মৃত্যু অবধি সাবিত্রী ভিক্ষে করে জীবন ধারণ করেন।

কড়ই-কাদিপুর গণহত্যার সবচেয়ে বড় গণকবরটি ডোমপুকুর পাড়ে অবস্থিত। এ পুকুর থেকে চাষের জমিতে সেচ দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। সেচের জন্য পুকুর পাড়ে তৈরি করা হয়েছিল বিরাট গর্ত, যাকে স্থানীয় ভাষায় বলে ভাতি। এই ভাতিতে গণহত্যার পর অগণিত লাশ মাটি চাপা দেওয়া হয়। কতজনকে এখানে গণকবর দেওয়া হয়েছিল তা জানা যায় না।

কাদার পুকুর পাড়ে ছিল আখের গুড় তৈরির বড় চুল্লি। চুল্লির সে গর্তে বহু লাশ গণকবর দেওয়া হয়।

একাত্তরে ২৬ এপ্রিল তারিখে জয়পুরহাট জেলার বম্বু ইউনিয়নের কড়ই ও কাদিপুর গ্রাম দুটি আক্ষরিক অর্থেই গণকবরে পরিণত হয়েছিল। গ্রামে সম্ভাব্য সব পুরুষকে একই দিনে হত্যা করা হয়। খুঁজতে গিয়ে কিছু দূর পরপর গণকবরের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। স্বাধীনতার পর অনেক চাষের জমিতে কৃষকেরা কাজ করতে গিয়ে মানুষের হাড় কঙ্কাল খুঁজে পেয়েছেন বলে জানা যায়। বম্বু ইউনিয়নের কড়ই ও কাদিপুর গ্রাম ঘুরলে এমন অসংখ্য গণকবর পাওয়া যাবে। কেননা পাকিস্তানি বাহিনী একদিনে কয়েক ঘন্টার মধ্যে দুটি গ্রামকে জনশূন্য করার জন্য গণহত্যা চালায়।

কড়ই-কাদিপুর গণহত্যায় দুটি গ্রামের হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রায় সব পুরুষকে হত্যা করা হয়। হত্যার পরপরই পরিবারের নারী ও অন্যান্যরা সীমান্তের ওপারে ভারতে চলে যান। পালাতে গিয়ে আদরের সন্তানের মৃত্যু হয় কারো কারো।[১৫] যুদ্ধ শেষে তাদের মধ্যে যারা বেঁচে ছিল তারা ফিরে আসে। কিন্তু ফিরে এসে তারা ঘরের ভিটের মাটি ছাড়া কিছুই পায়নি।[১৬] স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধুর সরকার তাদের প্রাথমিক পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছিল। কিন্তু ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু হত্যার পর তারা আবার দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়। বর্তমানে এ দুটি গ্রামে এসব শহিদ পরিবারকে খুঁজে পাওয়া আয়াসসাধ্য কাজ। অনেকেই স্থায়ীভাবে দেশ ছেড়ে চলে গেছেন। আবার অনেকে জয়পুরহাট ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়ে বসতি গড়েছেন। এর বাইরে একাত্তর সালে কড়ই-কাদিপুরের কোনো কোনো মুসলিম পরিবার হিন্দু সম্প্রদায়ের পাশে দাঁড়িয়েছিল। এসব প্রত্যক্ষদর্শী ও ভুক্তভোগীদের মধ্যে খুকু রাণী, অফি বর্মণ, দিজেনচন্দ্র দেবনাথ, মোল্লা শামসুল আলম, ইমদাদুল বারীসহ কয়েকজন কড়ই-কাদিপুর গণহত্যার সাক্ষ্য দিয়েছেন।

ডোমপুকুর পাড় গণকবর

কড়ই-কাদিপুর গণহত্যার সবচেয়ে বড় গণকবরটি ডোমপুকুর পাড়ে অবস্থিত। এ পুকুর থেকে চাষের জমিতে সেচ দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। সেচের

জন্য পুকুর পাড়ে তৈরি করা হয়েছিল বিরাট গর্ত, যাকে স্থানীয় ভাষায় বলে ভাতি। এই ভাতিতে গণহত্যার পর অগণিত লাশ মাটি চাপা দেওয়া হয়। কতজনকে এখানে গণকবর দেওয়া হয়েছিল তা জানা যায় না।

কড়ই গ্রামে কালার পুকুর গণকবর

জয়পুরহাট সদর উপজেলার বম্বু ইউনিয়নের কড়ই ও কাদিপুর নামে দুটি গ্রামে পাকিস্তানি বাহিনী একদিনে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করে। হিন্দু অধ্যুষিত গ্রাম দুটিতে ছিল নিরীহ শ্রম, কৃষিজীবী ও মৃৎশিল্পীদের বাস। পাকিস্তানি বাহিনী ২৬ এপ্রিল তারিখে একদিনে, একঘন্টার মধ্যে গ্রামদুটিকে জনশূন্য করে দিতে চেয়েছিল। প্রত্যক্ষদর্শী মোল্লা শামসুল আলম চেয়ারম্যান বলেন- 'আমি তখন ছাত্র ছিলাম,আমদের চোখের সামনে এই গণহত্যা হয়েছে। পুকুর পাড়ে যে বিভৎসতা দেখেছি তা কোনো মানুষ করতে পারে বলে আমি আজও বিশ্বাস করি না। পাকিস্তানিরা চলে যাওয়ার পর আমি বন্ধুদের নিয়ে সেখানে যাই। শত শত লাশের মধ্যে দশজনকে আমরা তখনও জীবিত পাই। দশটি গরুর গাড়ি ভাড়া করে তাদের সীমান্তের ওপারে ভারতে নিয়ে যাই চিকিৎসার জন্য। তাদের আমরা বাঁচাতে পেরেছিলাম।'[১৭]

কড়ই কাদিপুর গ্রাম গণকবর

একাত্তরে ২৬ এপ্রিল তারিখে জয়পুরহাট জেলার বম্বু ইউনিয়নের কড়ই ও কাদিপুর গ্রাম দুটি আক্ষরিক অর্থেই গণকবরে পরিণত হয়েছিল। গ্রামে সম্ভাব্য সব পুরুষকে একই দিনে হত্যা করা হয়। খুঁজতে গিয়ে কিছু দূর পরপর গণকবরের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। স্বাধীনতার পর প্রায় চাষের জমিতে কৃষকেরা কাজ করতে গিয়ে মানুষের হাড় কঙ্কাল খুঁজে পেয়েছেন।

সোনার পাড়া গণকবর

জয়পুরহাট সদরের বম্বু ইউনিয়নের কড়ই গ্রামের সোনার পাড়ায় শ্রী দিজেনচন্দ্র দেবনাথের বাড়ির সামনের জমিতে রয়েছে নয় জনের গণকবর। তাদের সামনেই এই নয়জনকে মাটি চাপা দেওয়া হয়। বম্বু ইউনিয়নের কড়ই ও কাদিপুর গ্রাম ঘুরলে এমন অসংখ্য গণকবর পাওয়া যাবে। কেননা পাকিস্তানি বাহিনী একদিনে কয়েক ঘন্টার মধ্যে দুটি গ্রামকে জনশূন্য করার জন্য গণহত্যা চালায়।

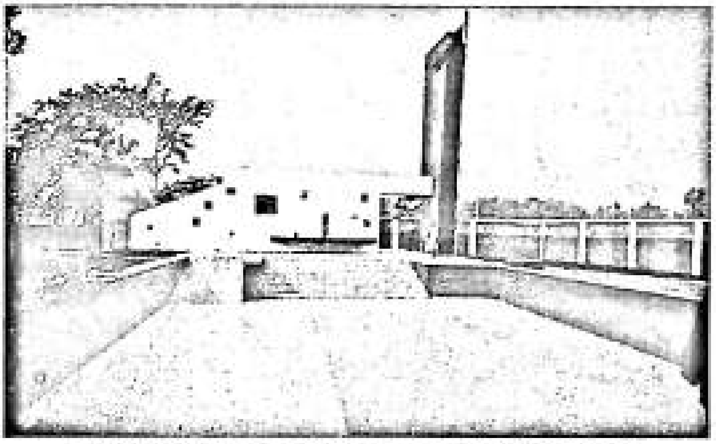

কড়ই-কাদিপুর গণহত্যায় শহিদের সম্মানে নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভ

কড়ই-কাদিপুর গণহত্যায় এখন পর্যন্ত যেসব শহিদের নাম জানা যায় তাদের তালিকা নিচে দেওয়া হলো-

ক্রম	নাম	পিতা	বয়স	পেশা
১	বুলি	অজ্ঞাত	-	
২	কৃষ্ণকান্ত বর্মণ	অজ্ঞাত	-	
৩	রাধাকান্ত বর্মণ	অজ্ঞাত	-	
৪	গুপিনাথ পাল	অজ্ঞাত	-	
৫	গিরেন চন্দ্র বর্মণ	অজ্ঞাত	-	কৃষক
৬	নরেন পাল	অজ্ঞাত	-	কুমার
৭	গোলাপ পাল	অজ্ঞাত	-	কুমার
৮	খগেন পাল	অজ্ঞাত	-	কুমার
৯	যতন পাল	অজ্ঞাত	-	কুমার
১০	রতন পাল	অজ্ঞাত	-	কুমার
১১	ভোলা পাল	অজ্ঞাত	-	কুমার
১২	হেদরা পাল	অজ্ঞাত	-	কুমার
১৩	রবিন পাল	অজ্ঞাত	-	কুমার
১৪	সুদেব পাল	অজ্ঞাত	-	কুমার
১৫	উজ্জল পাল	অজ্ঞাত	-	কুমার
১৬	গঙ্গাধর পাল	অজ্ঞাত	-	কুমার
১৭	সাধন পাল	অজ্ঞাত	-	কুমার
১৮	অনিল পাল	অজ্ঞাত	-	কুমার

ক্রম	নাম	পিতা	বয়স	পেশা
১৯	অখিল পাল	অজ্ঞাত	-	কুমার
২০	সুপান পাল	অজ্ঞাত	-	কুমার
২১	অধির বাবু	অজ্ঞাত	-	
২২	বাসুদেব পাল	অজ্ঞাত	-	কুমার
২৩	দেবী পাল	অজ্ঞাত	-	কুমার
২৪	সুকুমার পাল	অজ্ঞাত	-	কুমার
২৫	সুখু পাল	অজ্ঞাত	-	কুমার
২৬	সখি বালা	অজ্ঞাত	-	
২৭	শ্যমল বাবু	অজ্ঞাত	-	
২৮	অমল বাবু	অজ্ঞাত	-	
২৯	বগা পাল	অজ্ঞাত	-	কুমার
৩০	নিবারন পাল	অজ্ঞাত	-	কুমার
৩১	হাব্বুলা পাল	অজ্ঞাত	-	কুমার
৩২	রমনি পাল	অজ্ঞাত	-	কুমার
৩৩	হরেম পাল	অজ্ঞাত	-	কুমার
৩৪	হরেন পাল	অজ্ঞাত	-	কুমার
৩৫	তরনি পাল	অজ্ঞাত	-	কুমার
৩৬	অভিলাস	অজ্ঞাত	-	
৩৭	গোপেন	অজ্ঞাত	-	
৩৮	ক্ষিতিস	অজ্ঞাত	-	
৩৯	আজিনা পাল	অজ্ঞাত	-	কুমার
৪০	আমনা পাল	অজ্ঞাত	-	কুমার
৪১	বেনু পাল	অজ্ঞাত	-	কুমার
৪২	পরি পাল	অজ্ঞাত	-	কুমার
৪৩	পরেশ পাল	অজ্ঞাত	-	কুমার
৪৪	নিল কান্ত পাল	অজ্ঞাত	-	
৪৫	জয় বুব্ধ	অজ্ঞাত	-	
৪৬	প্রাণ বুব্ধ	অজ্ঞাত	-	
৪৭	শ্রীচরন	অজ্ঞাত	-	
৪৮	অধির পাল	অজ্ঞাত	-	কুমার
৪৯	মহেন্দ্র পাল	অজ্ঞাত	-	কুমার
৫০	সনদ পাল	অজ্ঞাত	-	কুমার

ক্রম	নাম	পিতা	বয়স	পেশা
৫১	গোলাপ পাল	অজ্ঞাত	-	কুমার
৫২	ভাদু পাল	অজ্ঞাত	-	কুমার
৫৩	ভূপেন পাল	অজ্ঞাত	-	কুমার
৫৪	রাম পাল	অজ্ঞাত	-	কুমার
৫৫	দিন বৃদ্ধ	অজ্ঞাত	-	
৫৬	সাধনা পাল	অজ্ঞাত	-	কুমার
৫৭	বিমল পাল	অজ্ঞাত	-	কুমার
৫৮	সুবল পাল	অজ্ঞাত	-	
৫৯	কমল পাল	অজ্ঞাত	-	কুমার
৬০	বিধা পাল	অজ্ঞাত	-	কুমার
৬১	রঞ্জন পাল	অজ্ঞাত	-	কুমার
৬২	নিখিল পাল	অজ্ঞাত	-	কুমার
৬৩	অজিৎ	অজ্ঞাত	-	
৬৪	অমল	অজ্ঞাত	-	
৬৫	দুঃখা বর্মণ	অজ্ঞাত	-	কৃষক
৬৬	হবেন শিবিন	অজ্ঞাত	-	
৬৭	ছেদরা	অজ্ঞাত	-	
৬৮	শিবেন	অজ্ঞাত	-	
৬৯	সন্তোষ বর্মণ	অজ্ঞাত	-	কৃষক
৭০	প্রাণ বল্লব	অজ্ঞাত	-	
৭১	দোদা	অজ্ঞাত	-	
৭২	অতিশ	অজ্ঞাত	-	
৭৩	যোগেশ	অজ্ঞাত	-	
৭৪	শিরিশ	অজ্ঞাত	-	
৭৫	পাঁচ কুড়ি	অজ্ঞাত	-	
৭৬	সুরেন	অজ্ঞাত	-	
৭৭	বদনা	অজ্ঞাত	-	
৭৮	তরমুজা	অজ্ঞাত	-	
৭৯	মুন্টু	অজ্ঞাত	-	
৮০	গুটি	অজ্ঞাত	-	
৮১	কমলা	অজ্ঞাত	-	
৮২	কমল	অজ্ঞাত	-	

ক্রম	নাম	পিতা	বয়স	পেশা
৮৩	অচানা	অজ্ঞাত	-	
৮৪	বাই চরণ	অজ্ঞাত	-	
৮৫	সিচরণ	অজ্ঞাত	-	
৮৬	হরেন পাল	অজ্ঞাত	-	
৮৭	হলাধর	অজ্ঞাত	-	
৮৮	পঞ্চ ডাক্তার	অজ্ঞাত	-	গ্রাম্য ডাক্তার
৮৯	গানা বুড়া	অজ্ঞাত	-	
৯০	বাটু	অজ্ঞাত	-	
৯১	লকিন	অজ্ঞাত	-	
৯২	তেলি বুড়া	অজ্ঞাত	-	
৯৩	হরা	অজ্ঞাত	-	
৯৪	চান্দা	অজ্ঞাত	-	
৯৫	সভলা	অজ্ঞাত	-	
৯৬	শ্যামল ডাক্তার	অজ্ঞাত	-	গ্রাম্য ডাক্তার
৯৭	অমল মাস্টার	অজ্ঞাত	-	
৯৮	সুদির	অজ্ঞাত	-	
৯৯	সুদেব	অজ্ঞাত	-	
১০০	বানি কান্ত	অজ্ঞাত	-	
১০১	মুঞ্জিলা কান্ত	অজ্ঞাত	-	
১০২	ময়রি বুড়া	অজ্ঞাত	-	
১০৩	প্রিয়	অজ্ঞাত	-	
১০৪	কৃষ্ণ ডাক্তার	অজ্ঞাত	-	গ্রাম্য ডাক্তার
১০৫	যোগেন পাল	অজ্ঞাত	-	কুমার
১০৬	খোকা	অজ্ঞাত	-	
১০৭	মহাভারত	অজ্ঞাত	-	
১০৮	সুবল পাল	অজ্ঞাত	-	কুমার
১০৯	বিনা দা	অজ্ঞাত	-	
১১০	রাম প্রসাদ পাল	অজ্ঞাত	-	কুমার
১১১	গোবিন্দ	অজ্ঞাত	-	
১১২	সুরমা	অজ্ঞাত	-	
১১৩	আতার বুড়ি	অজ্ঞাত	-	
১১৪	ঘোনা বুড়া	অজ্ঞাত	-	
১১৫	আঢ়ার বর্মণ	অজ্ঞাত	-	কৃষক

ক্রম	নাম	পিতা	বয়স	পেশা
১১৬	কাচা বর্মণ	অজ্ঞাত	-	কৃষক
১১৭	বিনোদ বর্মণ	অজ্ঞাত	-	কৃষক
১১৮	বানু সোনার	অজ্ঞাত	-	স্বর্ণ ব্যবসায়ী
১১৯	খুতি	অজ্ঞাত	-	
১২০	ফুত	অজ্ঞাত	-	
১২১	অমূল্য সোনার	অজ্ঞাত	-	স্বর্ণ ব্যবসায়ী
১২২	রনদা সোনার	অজ্ঞাত	-	
১২৩	সুধির মোহন্ত	অজ্ঞাত	-	স্বর্ণকার
১২৪	বাসুদেব সোনার	অজ্ঞাত	-	
১২৫	শ্যামল শাহা	অজ্ঞাত	-	
১২৬	বানী সোনার	অজ্ঞাত	-	
১২৭	আবদুস সাত্তার মন্ডল	অজ্ঞাত	-	
১২৮	শচিন	অজ্ঞাত	৩০	
১২৯	উপেন	অজ্ঞাত	৪৫	
১৩০	কোকোন	অজ্ঞাত	৬৫	
১৩১	দিজো	খুদিরাম	৩০	
১৩২	শিবেন	অজ্ঞাত	৪৫	
১৩৩	যোগেস	অজ্ঞাত	৬৫	
১৩৪	খুদিরাম	অজ্ঞাত	৭৫	
১৩৫	আমিন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ	সুকচাদ	৬৫	
১৩৬	সুরেশ	সুকচাদ	৫৫	
১৩৭	যতিশ	কেকারু	৭০	
১৩৮	ক্ষিতিশ	কেকারু	৬৫	
১৩৯	মহিন্দ্র	কেকারু	৭৫	
১৪০	দিলিপ	দেবেন	৫০	
১৪১	যতন	যতিশ	৩৫	
১৪২	পরিক্ষিত	যতিশ	২৫	
১৪৩	গুপিনাথ	অনাথ	৬৫	
১৪৪	অশ্বনি	নলিন	৪৫	
১৪৫	কানহা মহন্ত	অজ্ঞাত	৯৫	স্বর্ণকার
১৪৬	লক্ষণ	অজ্ঞাত	৫৫	
১৪৭	নারায়ণ	অজ্ঞাত		অজ্ঞাত

(অসম্পূর্ণ)

ভুক্তভোগী ও প্রত্যক্ষদর্শীর মৌখিক ভাষ্য

কড়ই-কাদিপুর গণহত্যায় দুটি গ্রামের হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রায় সব পুরুষকে হত্যা করা হয়। হত্যার পরপরই পরিবারের নারী ও অন্যান্যরা সীমান্তের ওপারে ভারতে চলে যায়। যুদ্ধ শেষে তাদের মধ্যে যারা বেঁচে ছিল তারা ফিরে আসে। কিন্তু ফিরে এসে তারা ঘরের ভিটের মাটি ছাড়া কিছুই পায়নি। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধুর সরকার তাদের প্রাথমিক পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছিল। কিন্তু ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু হত্যার পর তারা আবার দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়। বর্তমানে এ দুটি গ্রামে এসব শহিদ পরিবারকে খুঁজে পাওয়া দুঃসাধ্য কাজ। যে কয়েকটি পরিবার কড়ই-কাদিপুরে রয়েছে তাদের মধ্যে জীবিত ভুক্তভোগীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। অনেকেই স্থায়ীভাবে দেশ ছেড়ে চলে গেছেন। আবার অনেকে জয়পুরহাট ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়ে বসতি গড়েছেন বলে জানা গেলেও তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। এর বাইরে একাত্তর সালে কড়ই-কাদিপুরের যেসব মুসলিম পরিবার হিন্দু সম্প্রদায়ের পাশে দাঁড়িয়েছিল, প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে।

খুদবালা (৭৫)

স্বামী: যোগেন (কড়ই-কাদিপুর গণহত্যায় শহিদ), পেশা: গৃহিনি, গ্রাম: কড়ই, ইউনিয়ন: বম্বু, জেলা: জয়পুরহাট, সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: নিজ বাড়ি, ৯ জানুয়ারি ২০১৯

খুদবালা, যোগেন স্বামীর নাম, আমার বাবা, কাকা, জেঠা, সবাইকে মাঠে নিয়ে মারছে। আমরা বউ মানুষ, দৌড়ে জঙ্গলে পালায় গেছি। মিলিটারি সেদিন মারলো আর এখানে আসে নাই। দৌড় মাইরা আসছে মারছে, দৌড় মাইরা চলে গেছে, শয়ে শয়ে মারছে। গ্রামের যত পুরুষ মারছে। বিধবাদের বাড়িঘর সব বাঙালিরা লুট করছে, সংসারের জিনিস সব লুট করে নিয়ে গেল। বিধবারা সব ঐ পাড়ে চলে গেল। নমাস থেকে এসে বাড়ি ঘর কিছু পাই নাই। সরকার থেকে ঘর করে দিসে। বহু কষ্টে দিন কাটছে।

পুকুরানী (৭০)

স্বামী: সুবল চন্দ্র বর্মণ (কড়ই-কাদিপুর গণহত্যায় শহিদ), পেশা: গৃহিনি, গ্রাম: কড়ই, ইউনিয়ন: বম্বু, জেলা: জয়পুরহাট, সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: নিজ বাড়ি, ৯ জানুয়ারি ২০১৯

সোমবার দিন মিলিটারি আসলো। স্বামী সুবল চন্দ্র বর্মণ কৃষি কাজ করত। দৌড়া দৌড়ি শুরু হলো, মাঠের মধ্যে নিয়ে মারলো। আমার স্বামীকে মারলো, আমার তখন সাত মাসের সন্তান ছিল দৌড়াদৌড়ি করে পালাতে গিয়ে সন্তানটা মরে গেল। একটা পাখির ঝাঁককে যেমন গুলি করে, কেউ গোসল করছে, কেউ খাচ্ছে, কেউ ভাতের হাঁড়ি তুলেছে এই অবস্থায় মারলো। এলাকার মানুষের সব লুট করে নিল। নমাস পরে আসলাম, কিছু ছিল না, সরকার ঘর তুলে দিসে। সেখানে ছিলাম। অনেক কষ্টের জীবন।

দিজেনচন্দ্র দেবনাথ (৬৫)

পিতা: (কড়ই-কাদিপুর গণহত্যায় শহিদ), পেশা: কৃষি, গ্রাম: কড়ই, ইউনিয়ন: বম্বু, জেলা: জয়পুরহাট, সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: নিজ বাড়ি, ৯ জানুয়ারি ২০১৯

বয়স ১৭ বছর, মিলিটারি যেদিন আসলো বাড়িতে ছিলাম। শুনতে পেয়ে বাবাসহ আমরা সবাই বের হলাম। আমরা যা জিনিস নিয়ে বের হলাম, গ্রামের লোক তা কেড়ে নিল। জসিম মাওলানা আমাদের বললো পাকিস্তানি আসছে, তোমরা সেখানে গিয়ে পাকিস্তানের কথা বলো। আমরা আমাদের পরিবারের আট-দশজন ছিলাম, যাওয়ার পথে দেখি গ্রামেরম সাত-আটজনকে মেরে রেখে গেছে পাকিস্তানিরা। গ্রামের লোকজন তাদের মাটি চাপা দেওয়ার জন্য গর্ত

খুঁড়ছে। আমার বাবা তখন বললেন- 'আমাদেরকে মিথ্যা কথা বলে মারার জন্য নিয়ে যাচ্ছে, ওই দেখ তার প্রমাণ। বাবা তুই যেভাবে হোক পালা।' পালাতে গেল আমাকে ধরে ফেললো রশিদ, আমি বললাম ভাই আমার পানি পিপাসা লাগছে, রশিদ আমার সঙ্গে আসলো। মালিকের কি ইচ্ছা, যখন টিউবওয়েলে পানি খেতে গেলাম দেখলাম বাকেট পড়ে গেল। রশিদকে বললাম তুমি থাকো আমি পুকুর থেকে একটু পানি খেয়ে আসি। পানি খেতে যাওয়ার কথা বলে চললাম, রশিদ আমার পরিবারের অন্যদের কাছে গেল। তখন আমি কি পানি খাবো কাঁচা পায়খানার মধ্যে লুকালাম।

কুটাল পুকুরের কাছে যেতে পাঞ্জাবি আমার পরিবারে নয়জনকে একসাথে গুলি করে মেরে ফেললো। আমাদের বাড়ির সামনের ঠিক মাঠের জমিতে তাদের পুতে রেখেছে। আমার সামনে জীবিত একজনকে বাঙালি একজন কোপ দিয়ে গর্তে ফেলে দিল। বাড়ি এসে দেখলাম লুটপাট শুরু হয়ে গেছে। জীবন বাঁচাতে এসব রেখে পাশে গ্রামে চলে গেলাম। একসাথে পড়তাম তার বাড়িতে গেলাম, তারা আমাকে মুড়ি গুড় দিল, খাওয়া কি আর গলা দিয়ে নামে, গামছায় বেধে রাখলাম। ওরা আমাকে লুকিয়ে রাখলো কয়দিন। তারপর গ্রামের সবাই মিলে ইন্ডিয়াতে চলে গেলাম।

আমাদের পরিবারের যাদের সেদিন মেরে ফেলেছে, নামগুলো খাতায় লিখে এনেছিলাম- খুদিরাম (৭৫) ও যোগেস (৬৫) দুই ভাই, শিবেন (৪৫), খুদিরামের ছেলে দিজো (৩০), কোকোন (৬৫), উপেন (৪৫), শচিন (৩০), সুকচাদের দুই ছেলে আমিন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ (৬৫) ও সুরেশ (৫৫), কেকারুর তিন ছেলে যতিশ (৭০), ক্ষিতিশ (৬৫) ও মহিন্দ্র (৭৫), দেবেনের পুত্র দিলিপ (৫০), যতিশের দুইপুত্র যতন (৩৫) ও পরিক্ষিত (২৫), গুপিনাথ (৬৫), রতন (৪৫) পিতা অনাথ, অশ্বনি (৪৫) পিতা নলিন, কানহা মহন্ত (৯৫), লক্ষণ (৫৫)।

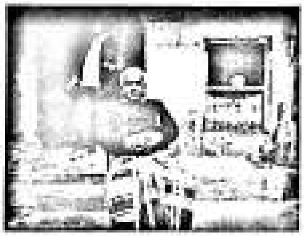

মোল্লা শামসুল আলম

পিতা : আবদুস সালাম মোল্লা, পেশা: রাজনীতি, গ্রাম: কড়ই, ইউনিয়ন: বম্বু, জেলা: জয়পুরহাট, সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: নিজ বাড়ি, ৯ জানুয়ারি ২০১৯

একাত্তর সালে আমি আইএ ফাস্ট ইয়ার-এর ছাত্র ছিলাম। কুড়ার পুকুরের পাড়ের মধ্যে স্থানীয় হিন্দুদের লাইন করে শুইয়ে রাখা হয়েছে, একজন একজন করে ডেকে হত্যা করছে, আমি সাতাশ জন পর্যন্ত গুণলাম, তারপর আর পারলাম না। আমি হতবাক হয়ে গেলাম, মানুষ মানুষকে এভাবে মারতে পারে। একঘন্টার মতো সময় তারা গণহত্যা চালালো। তারপর চলে গেল। আমি দেখলাম আমার প্রিয় ডাক্তারের লাশ, সহপাঠীর লাশ, বন্ধু বান্ধবের লাশ, একজনের হুকার আগুন তখনও জ্বলছে তাকে হত্যা করা হয়েছে। আমি কয়েকজন বন্ধুবান্ধব নিয়ে গেলাম কাউকে সাহায্য করা যায় কিনা। তিন বন্ধুসহ আমরা দেখলাম অগুনতি লাশ যেখানে যাই সেখানে লাশ, ছোট বেলায় আমরা যার কাছ থেকে জিলাপি কিনতাম, তাকে গুলি করে মেরেছে, তার খুলিটা উড়ে গেছে। তার লাশটা যখন কাঁধে নিলাম, মগজ গলে আমার পিঠের ওপর পড়ছে। দেখলাম কেউ কেউ বেঁচে আছে। তাদের বাঁচাতে দশটি গরুর গাড়ি ভাড়া করলাম, দশজনকে পাঠালাম ভারতের বালুরঘাট চিকিৎসা করার জন্য। তারা বেঁচে ছিল কিন্তু দেশে থাকতে পারে নাই। বঙ্গবন্ধু হত্যার পর তাদের জমিজমা নিয়ে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। এখানে যে নৃসংশতা হয়েছে তা কোনো সভ্য মানুষ করতে পারে না। যাদের মেরেছে তারা সাধারণ মানুষ তারা মৃৎশিল্পী।

ইমদাদুল বারি (৭০)

পেশাঃ কৃষি, গ্রামঃ কড়ই, ইউনিয়নঃ বম্বু, জেলাঃ জয়পুরহাট, সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখঃ কড়ই-কাদিপুর বধ্যভূমি স্মৃতিসৌধ স্কুলঘর, ৯ জানুয়ারি ২০১৯

১৯৭১ সালে কড়ই-কাদিপুরে আমাদের চোখের সামনে পাকিস্তানিদের যে বর্বরতা দেখেছি তাতে তাদেরকে আমার মানুষ বলে মনে হয়নি। তাদেরকে সাহায্য করেছে আমাদের দেশের দালালরা। জয়পুরহাটের বড় রাজাকাররা তো আছেই কড়ই-কাদিপুরের গণহত্যায় মান্নান মৌলবির হাত ছিল

সবচেয়ে বেশি। কড়ই-কাদিপুরের মানুষ নৌকায় ভোট দিয়েছিল এটাই ছিল তাদের বড় দোষ। গণহত্যার পর শহিদের পরিবারের লোকজন ওপাড়ে চলে যায়। কিন্তু দেশ স্বাধীন হলেও তারা এদেশে স্থায়ী হতে পারেনি। বিশেষ করে বঙ্গবন্ধু হত্যার পর মান্নান মৌলবি কাদিপুরের হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের সমস্ত সম্পত্তি দখল করে নেয়।

গণহত্যার শিকার পরিবারগুলোর বর্তমান অবস্থা

কড়ই-কাদিপুরে গণহত্যার শিকার পরিবারগুলোর বর্তমান অবস্থা জানা অনেকটাই দুরূহ। কেননা সিংহভাগ পরিবার দেশান্তর হয়েছে। আবার অনেকে গ্রাম ছেড়েছে, কেউবা অন্য জেলায়। স্বাধীন দেশেও তারা নিজ গ্রামে থাকার মতো যথেষ্ট নিরাপত্তা পায়নি। বিশেষ করে বঙ্গবন্ধু হত্যার পর একাত্তরের মতোই তাদের আরো একবার দেশ ছাড়তে হয়। তবে পার্থক্য হলো- একাত্তরে তারা স্বাধীনতার দিন গুণেছিল, কিন্তু এবার আর তাদের অপেক্ষার পালা শেষ হলো না। যারা শত অত্যাচার সয়ে বাংলার মাটিতে পড়ে আছেন তাদের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত করুণ। এখনও মাটির ঘরে তাদের বসতি। বসতভিটাটুকুই সম্বল। এদেশের স্বাধীনতার জন্য তাদের স্বজনেরা প্রাণ দিয়েছে, কিন্তু দেশের স্বাধীনতা তাদের জীবনের নিরাপত্তা ও উন্নয়ন কিছুই নিশ্চিত করতে পারেনি।

স্মৃতি সংরক্ষণের প্রয়াস

কড়ই কাদিপুরের একটি স্থানে ডোমপুকুর পাড়ে স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয়েছে। কিন্তু এ সৌধ থেকে ভবিষ্যত প্রজন্ম কড়ই-কাদিপুর গণহত্যার ব্যাপকতা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া থেকে বঞ্চিত হবে বলে মনে হয়। কেননা সৌধে এ ধরনের কোনো বিবরণ সংযুক্ত করা হয়নি। এ দুটি গ্রামের বহু স্থানে গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে এবং অসংখ্য গণকবরের সৃষ্টি হয়েছে। যথাযথ স্মৃতি সংরক্ষণে দুটি পন্থা অবলম্বন করা যায়- মূল স্মৃতিসৌধটিতে অন্যান্য স্থানের উল্লেখ ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ। অথবা গণহত্যার প্রতিটি স্থলে অন্তত একটি ছোট আকৃতির ফলক স্থাপন করা যেখানে স্থানটিতে সংঘটিত ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ থাকবে।

মূল্যায়ন

কড়ই-কাদিপুর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি নৃসংশতার একটি অন্যতম উদাহরণ। এখানে মাত্র এক ঘন্টার মধ্যে দুটি গ্রামের হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রায় সব

পুরুষকে গুলি করে হত্যা করা হয়। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত গ্রামের কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষেরা মানুষের তৈরি এমন দুর্যোগ কখনও কল্পনাও করতে পারেনি। যদিও এপ্রিল মাসের শেষের দিকে বিভিন্ন গ্রাম থেকে তারা পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের সহযোগীদের নানা অপকীর্তির কথা শুনছিল। তারপরও প্রিয় দেশ, প্রিয় বসতবাড়ি ছেড়ে কোথাও যাওয়ার কথা তারা চিন্তা করতে পারেনি। ২৬ এপ্রিল রাজাকারদের একটি বড় দলসহ পাকিস্তানি সেনারা কড়ই-কাদিপুর গ্রাম দুটিতে প্রবেশ করে। তারা বাড়ি ঘরে আগুন দিতে গ্রামের মানুষদের মাঠে এসে জড়ো হওয়ার নির্দেশ দেয়। হতবিহ্বল গ্রামবাসী স্ত্রী সন্তান নিয়ে ঘর ছেড়ে মাঠে এসে জড়ো হয়। পাকিস্তানিদের নির্দেশে দালালেরা পুরুষদের আলাদা করে সারি সারি দাঁড় করায়। স্ত্রী সন্তানেরা জঙ্গলে পালিয়ে থাকে। এরপর সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ান মানুষগুলোকে হত্যা করতে শুরু করলে কারো কারো স্ত্রী সন্তানেরা এসে দালালদের হাতে পায়ে ধরে স্বজনদের প্রাণ ভিক্ষা চাইতে লাগল। কিন্তু তাতে কেউ রক্ষা পেল না। অবশ্য গ্রামে কোথাও কোথাও দালালেরা কোনো কোনো পরিবারের অর্থ-সম্পদ, স্বর্ণালংকার হাতিয়ে নিয়ে কাউকে কাউকে পালিয়ে যেতে সহায়তা করে। কিন্তু সেদিন কড়ই-কাদিপুরে মানবতা চরমভাবে অপমানিত হয়। স্থানীয় মানুষেরাই সেদিন গণহত্যায় পাকিস্তানি হানাদারদের সহায়তা করে। মানুষকে মানুষ এভাবে হত্যা করতে পারে বাংলার গ্রামের নিরীহ মানুষদের কাছে তা ছিল চিন্তার অতীত। অথচ সেদিন কড়ই কাদিপুরে তাই ঘটেছিল।

তথ্যসূত্র

১. এম এ হাসান, *যুদ্ধাপরাধ গণহত্যা ও বিচারের অন্বেষণ*, ওয়ার ক্রাইমস্ ফ্যাক্টস্ ফাইন্ডিং কমিটি জেনোসাইড আর্কাইভ এন্ড হিউম্যান স্টাডিস সেন্টার, ঢাকা, ২০০১
২. মুনতাসীর মামুন (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধ কোষ- দ্বিতীয় খণ্ড*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৩
৩. শামসুজ্জামান খান (সম্পা.), *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা : জয়পুরহাট*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৪, পৃ ২৩, ২৫
৪. আমিনুল হক বাবুল, *মুক্তিযুদ্ধে কিশোর ইতিহাস: জয়পুরহাট জেলা*, তাম্রলিপি, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ১৭
৫. *বাংলাপিডিয়া ওয়েবসাইট*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি
৬. বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, *জার্নাল ৭১*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০০২, প্রথম প্রকাশ ১৯৭৩, পৃ. ২৪-২৫
৭. বিস্তারিত, মফিজ চৌধুরী, *বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রীসভায়*, ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯১
৮. বিস্তারিত, আবুল কাসেম (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধে জয়পুরহাট*, জয়পুরহাট জেলা প্রশাসন, ১৯৯৯

৯. প্রাগুক্ত।
১০. ইমদাদুল বারি (৭০), পেশা: কৃষি, গ্রাম: কড়ই, ইউনিয়ন: বম্বু, জেলা: জয়পুরহাট, সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: কড়ই-কাদিপুর বধ্যভূমি স্মৃতিসৌধ স্কুলঘর, ৯ জানুয়ারি ২০১৯
১১. আমিনুল হক বাবুল, মুক্তিযুদ্ধে *কিশোর ইতিহাস: জয়পুরহাট জেলা*, তাম্রলিপি, ঢাকা, ২০১৭
১২. দিজেনচন্দ্র দেবনাথ (৬৫), পিতা: (কড়ই-কাদিপুর গণহত্যায় শহিদ), পেশা: কৃষি, গ্রাম: কড়ই, ইউনিয়ন: বম্বু, জেলা: জয়পুরহাট, সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: নিজ বাড়ি, ৯ জানুয়ারি ২০১৯
১৩. মোল্লা শামসুল আলম (৭০), পিতা : আবদুস সালাম মোল্লা, পেশা: রাজনীতি, গ্রাম: কড়ই, ইউনিয়ন: বম্বু, জেলা: জয়পুরহাট, সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: নিজ বাড়ি, ৯ জানুয়ারি ২০১৯
১৪. দিজেনচন্দ্র দেবনাথ (৬৫), পিতা: (কড়ই-কাদিপুর গণহত্যায় শহিদ), পেশা: কৃষি, গ্রাম: কড়ই, ইউনিয়ন: বম্বু, জেলা: জয়পুরহাট, সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: নিজ বাড়ি, ৯ জানুয়ারি ২০১৯
১৫. খুদ বালা (৭০), স্বামী: সুবল চন্দ্র বর্মণ (কড়ই-কাদিপুর গণহত্যায় শহিদ), পেশা: গৃহীনি, গ্রাম: কড়ই, ইউনিয়ন: বম্বু, জেলা: জয়পুরহাট, সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: নিজ বাড়ি, ৯ জানুয়ারি ২০১৯
১৬. শুকুরানী (৭৫), স্বামী: যোগেন (কড়ই-কাদিপুর গণহত্যায় শহিদ), পেশা: গৃহীনি, গ্রাম: কড়ই, ইউনিয়ন: বম্বু, জেলা: জয়পুরহাট, সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: নিজ বাড়ি, ৯ জানুয়ারি ২০১৯
১৭. মোল্লা শামসুল আলম (৭০), পিতা : আবদুস সালাম মোল্লা, পেশা: রাজনীতি, গ্রাম: কড়ই, ইউনিয়ন: বম্বু, জেলা: জয়পুরহাট, সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: নিজ বাড়ি, ৯ জানুয়ারি ২০১৯